দেরিদা-দর্শনের একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকা

কল্যাণ সেনগুপ্ত

২

দেরিদা-দর্শনের বৈচিত্র্য, ব্যাপকতা ও জটিলতার যথার্থ রূপায়ন খুব সহজসাধ্য নয়। তবু এই প্রবন্ধে আমি অন্তত একটি রূপরেখা দিতে চেয়েছি। এই আশা নিয়ে—দেরিদার গভীর মননের কিছুটা ইঙ্গিত হয়তো এর মধ্যে পাওয়া যাবে। বলা বাহুল্য, দেরিদার অনুপ্রবেশ সাহিত্যে যতটা দর্শনে ততটা নয়। বরং বলা যেতে পারে বিদগ্ধ সাহিত্যিক মহলই তাঁকে আবিষ্কার করেছে, নিয়ে এসেছে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে। এই মহলের হাতেই তাঁর উজ্জ্বল উদ্ধার—এই মহলই তাঁর বিভিন্ন রচনার বা তাঁর বিনির্মাণ কৌশলের মধ্যে দেখতে পেয়েছে এক নবতর সাহিত্য তত্ত্বের উজ্জ্বল দিগন্ত। সে হিসেবে প্রতিষ্ঠিত দার্শনিক মহলে তাঁর আবেদন তেমন নাড়া দিতে পারেনি। কেন এই বৈষম্য? কেন দার্শনিক যেখানে বিমুখ, সাহিত্যিক সেখানে তাঁর প্রসন্ন মুখ ফেরান দেরিদার দিকে? অথচ দেরিদা তো দর্শন বিষয়েই কথা বলেছেন। বস্তুত তাঁর বিনির্মাণ শুরুই হয়েছে পাশ্চাত্য দার্শনিক হুসার্ল-এর বিরুদ্ধে এক তীব্র-প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে। তাঁর রচিত **স্পিচ অ্যান্ড ফেনোমেনা, অফ গ্রামাটোলজি, মার্জিনস অফ ফিলোসফি**—সবই দর্শন বিষয়ক। তবে সাহিত্য অনুরাগীর মনোযোগ তিনি আকর্ষণ করেন কোন গুণে?

হয়তো এর একটি কারণ—দেরিদার ঝোঁক যত না বক্তব্য বিষয়ের দিকে তার চেয়েও বেশি প্রকাশভঙ্গির উপর। কী বলব তার চেয়েও তাঁর কাছে বেশি গুরুত্ব পায় কেমন ভাবে বলব। বিষয়ের চেয়েও শৈলীর প্রতি তাঁর অধিকতর মনোযোগ। বলা বাহুল্য, দেরিদা তাঁর টেক্সটে যে ভাষা ব্যবহার করেছেন তা প্রচলিত অর্থে সাধারণ ভাষা নয়। কিন্তু কোনো একটি টেক্সটের শব্দ চয়ন স্থায়ী বা আবদ্ধ লৌকিক ভাষার অনুগামী কিনা সেটাই বড় কথা নয়; বড় কথা হচ্ছে সেই লৌকিক ভাষার মধ্যে এমন কোনো পথ তৈরি করা যায় কিনা যেখান দিয়ে নতুন ও অপরিচিত ভাষার অর্থও আমাদের কাছে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। বস্তুত কবিরা এই কাজই করে থাকেন। তাঁদের বিশিষ্ট শব্দ প্রয়োগের মধ্যে আমরা পরিচিত অর্থকেই নতুন ভাবে পাই। এ কথা দেরিদা সম্পর্কেও প্রযোজ্য। তাঁর শব্দ প্রয়োগের চাতুর্য, প্রকাশের বিশেষ কৌশল আমাদের কাছে অপরিচিত মনে হলেও তার সুরটি আমাদের পরিচিত সাধারণ ভাষার আবহের মধ্যেই বাঁধা আছে। সিম্বলিস্টদের মতো তাঁর কাছেও ভাষা তার নিজস্ব দীপ্তিতেই আলোকিত। হয়তো এই কারণেই প্রচলিত দার্শনিক ভাবনা থেকে তিনি দূরে সরে গিয়েছেন। দার্শনিকরা সাধারণত শব্দ যোজনাকে অর্থ প্রকাশের

সঙ্গে অন্বিত করেন। কিন্তু দেরিদা এই শব্দার্থ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে বিশেষ ভাবে যা তুলে ধরতে চেয়েছেন তা হচ্ছে ভাষার নিজস্ব সংগীত ও ধ্বনি, নিজস্ব শক্তি ও বিন্যাস। ভাষা তাই তাঁর কাছে দি প্লে অফ সিগনিফায়ার্স—যেখানে শব্দের বিন্যাস ধ্বনি বা সংগীত নির্ভর। কবিরা এই ভাবেই তাঁদের শব্দ নির্বাচন করেন। ভাষার এই অন্তর্লীন সংগীতময়তাকে দেরিদা প্রাধান্য দিয়েছেন বলেই হয়তো সাহিত্যমহল তাঁকে সাগ্রহে বরণ করে নিয়েছে। কিন্তু ভাষাকে তার নিজস্ব শক্তিতে দেখার এই প্রবণতা, শৈলী, অচেনা আলোয় ভাস্বর শব্দ দিয়ে ইস্থেটিক ম্যাজিক তৈরি করার এই সব ঝোঁক কি আমাদের সত্য থেকে সরিয়ে দেয় না, যে সত্য দার্শনিকের অন্বিষ্ট বস্তু, যে সত্যকে প্রকাশ করার মধ্যেই তিনি ভাষার বিশেষ উদ্দেশ্যটি খুঁজে পান? এ কি রেটোরিকাল এফেক্টের কাছে সত্যকে বিসর্জন দেওয়া নয়? প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়, ভিটগেনস্টাইনও কখনো-কখনো ভাষা ব্যবহারে এই সূক্ষ্ম চাতুর্য, এই নাটকীয়তার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। কখনো-কখনো বক্তব্য থেকে বচন-কুশলতা, বিমূর্ত দার্শনিক ভাবনা বা বিষয় থেকে প্রকাশ নৈপুণ্যের উপর জোর দিয়ে তিনি বলেছেন :

"What I'm doing is also persuasion. If someone says : 'There is not a difference' and I say : 'There is a difference' I am persuading. I am saying 'I don't want you to look at it like that'." (**লেকচার্স অ্যান্ড—কনভারসেসনস্ অফ ইসথেটিক্স, সাইকোলজি অ্যান্ড রিলিজিয়াস বিলিফ**)

ভিটগেনস্টাইনের এই বক্তব্যের মর্মার্থ এই : কোনো দার্শনিক ভাবনা যথার্থ বা সত্য কিনা সেটি তেমন বড় কথা নয়; বড় কথা হচ্ছে বাগ্‌ভঙ্গির কারুকাজ, চাতুর্য ও নাটকীয়তাকে আশ্রয় করে সেই ভাবনাটি পাঠকের মনে সঞ্চারিত করে দেওয়া যায় কিনা; এমন করে পরিবেশন করা যায় কিনা যাতে সেই ভাবনা পাঠককে মুগ্ধ ও প্রভাবিত করে। সত্য বড় নয়, বড় হচ্ছে ভাষার যাদু। বলা বাহুল্য, এই ধরনের কথা দার্শনিককে মুগ্ধ করতে পারে না। এবং তারই প্রতিফলন দেখেছি প্লেটোর এই বিশিষ্ট বয়ানে :

"The poetic-workman dabs on certain colours by using the words and phrases of the various arts.....so that others, as ignorant as himself, taking their view from words, think he is speaking magnificiently...so great is the natural charm in this manner of speaking" (**রিপাব্লিক, বুক ১০**)।

কিন্তু দার্শনিকদের এই ধরনের আপত্তির বিরুদ্ধে দেরিদার স্বপক্ষে দু-একটি কথা যে বলার নেই তা নয়। দার্শনিক তত্ত্ব বা সত্য নিতান্তই অসার, বা দর্শনের কোনো গুরুত্ব নেই এমন দাবি তিনি করেননি। কিন্তু সব কিছুর আগে প্রয়োজন যে ভাষায় দার্শনিক কথা বলেন সেই ভাষার গভীরে প্রবেশ করা, খুঁজে দেখা তার শক্তি কোথায় নিহিত আছে। দেরিদা শুধু এইটুকুই আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

দেরিদার বিনির্মাণের আর একটি বৈশিষ্ট্য মুখের ভাষার (speech) চেয়ে লিখিত ভাষাকে (writing) বেশি গুরুত্ব দেওয়া। আমরা জানি প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য ঘরানায় কথাকে লেখার চেয়ে বেশি মূল্য দেওয়া হয়েছে। এর কারণ কথা বলার সময় বক্তা ও শ্রোতা দুজনেই উপস্থিত থাকে। বক্তা, শ্রোতা ও কথার মধ্যে কোনো স্থান বা কালের দূরত্ব নেই। বক্তা জানে সে কথা বলছে এবং একই সঙ্গে শ্রোতা জানে বক্তা তার সঙ্গে কথা বলছে। বক্তা কী বলতে চায়, প্রকাশ করতে চায় কোন্ অর্থ, শ্রোতার কাছে তা পরিস্ফুট করবার জন্য সে নিজেই উপস্থিত থাকে। শ্রোতার বুঝতে অসুবিধে হলে বক্তা নিজেই সে অসুবিধা দূর করে দিতে পারে। কিন্তু কোনো লেখা যখন আমরা পড়ি তখন লেখক অনুপস্থিত থাকেন। সুতরাং অনেক সময় তাঁর অভিপ্রায় ধরতে না পারলে সেটি ধরিয়ে দেবার জন্য তাঁকে পাওয়া যায় না। এই জন্য প্লেটো তাঁর **ফিদ্রাস** গ্রন্থে বলেছেন, লেখা কথার চেয়ে নিকৃষ্ট। কেননা লেখক তাঁর অভীষ্ট অর্থটি পৌঁছে দেবার জন্য পাঠকের কাছে থাকেন না। প্লেটো বা পাশ্চাত্য দার্শনিকদের এই বিশ্বাসের অনুরণন আমাদের দেশেও দেখতে পেয়েছি। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী বা ব্যাকরণ কথ্য সংস্কৃত ভাষার ধ্বনির উপর নির্ভর করেই রূপায়িত হয়েছে। বেদে, আরেয় আরণ্যকে বলা আছে, যদি কেউ মাংস খায়, বা মৃতদেহ দেখে, অথবা লেখায় ব্যাপৃত থাকে তবে সে বেদমন্ত্র উচ্চারণ করার অধিকারী নয়। মুখের ভাষার প্রতি এই অবিচলিত আস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দেরিদার বিপরীত ঝোঁক বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। কথা ও লেখার এই দুটি বিপরীত প্রান্তের শেষেরটি দেরিদার বেছে নেওয়ার এই বিনির্মাণ নিছক এক চমক সৃষ্টি করার জন্য নয়। এর পিছনে আছে এক গভীরতর যুক্তি। কোনো একটি শব্দের যে অর্থ সেটি সর্বক্ষেত্রেই এক হবে। সুতরাং কোনো বক্তা সেই কথাটি বলার জন্য যদি উপস্থিত নাও থাকেন, যদি তাঁর অভিপ্রায় আমরা না জানতে পারি তবু সেই কথাটির অর্থ হানি ঘটবে না। অর্থাৎ শব্দের অর্থ বুঝতে বক্তার সান্নিধ্যের কোনো প্রয়োজন নেই। একটি ভাষাকে আয়ত্ত করতে পারলেই তার শব্দের অর্থও আমাদের আয়ত্তে আসবে। লিখিত ভাষা (writing) এই সত্যটিকে তুলে ধরে বলেই দেরিদা একে প্রাধান্য দিয়েছেন।

২

উপরের আলোচনা থেকে হয়তো এ কথা উঠে আসে যে দেরিদা তাঁর বিনির্মাণে সাহিত্য ও দর্শনের মধ্যে একটি সেতু তৈরি করতে চান। কিন্তু কেমন ভাবে তৈরি হবে সেই সেতু? এর অর্থ কি এই—সাহিত্য ও দর্শনের মধ্যে বিভাজন রেখা তিনি একেবারে তুলে দিতে চান? প্রখ্যাত সাহিত্য সমালোচক জোনাথন কুলার অবশ্য তা মনে করেন না। তাঁর মতে, বিনির্মাণের উদ্দেশ্য সাহিত্য ও দর্শনের মধ্যে পার্থক্য একেবারে তুলে দেওয়া নয়, বরং তাদের সাযুজ্যকে নতুন ভাবে দেখা। হাইডেগারের মতো কুলারও দার্শনিক (thinkers) ও কবির (poets) মধ্যে একটি তফাত রাখতে চান। এবং তারপর বলতে চান, এই স্বতন্ত্রতা সত্ত্বেও তাদের মধ্যে যে এক গভীরতর পারস্পরিক নির্ভরতা

আছে সে কথা উপস্থাপিত করাই বিনির্মাণের উদ্দেশ্য। এই মেলবন্ধন তুলে ধরতে গিয়ে কুলার বলেছেন, যে কোনো দার্শনিক রচনাই 'fictive rhetorical construct' : সেখানে প্রাণ পায় চিন্তনের এক বিশেষ রীতি, এক বিশেষ বাগ্‌ভঙ্গি, কল্পনার এক বিশেষ অবয়ব। অপরদিকে কোনো সাহিত্যরচনা পাপ (evil), পুণ্য (good), নিত্য (eternity), অনিত্য (temporal) ইত্যাদি দার্শনিক অনুধ্যানকে আশ্রয় করেই গড়ে ওঠে। অবশ্য সংরক্ষণশীল দার্শনিক বা কবির কাছে এ ধরনের কথা অত্যন্ত গোলমেলে হয়ে ওঠে। সংরক্ষণশীল দার্শনিক মনে করেন তাঁর ভাষা বিশুদ্ধ ও স্বচ্ছ, কবিতার ভাষার ধারে-কাছেও তা আসেনা। তিনি মনে করেন, তাঁর রচনা কোনো অর্থেই 'fictive rhetorical coustruct' নয়। অন্যদিকে সংরক্ষণশীল কবি মনে করেন, তাঁর কবিতায় স্বতঃস্ফূর্ত সংগীত কোনো দার্শনিক তত্ত্বের ভারে নিপীড়িত নয়। সুতরাং তাঁরা যখন শোনেন যে তাঁরা পরস্পরের কাছে ঋণী তখন স্বভাবতই তাঁরা শিহরিত হয়ে ওঠেন।

তবে দার্শনিক রিচার্ড রোর্টির মতো আমারও মনে হয়, কুলারের ব্যাখ্যা তেমন সংগত নয়। আমার মনে হয়, দেরিদা দর্শন ও সাহিত্যের মধ্যে সীমারেখাটিই তুলে দিতে চান। তাঁর কাছে দর্শনও সাহিত্য। সাহিত্যের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে জিওফ্রি হার্টম্যান বলেছেন :

"Is not literary language the name we give to a diction whose frame of reference is such that the words stand out as words (even as sounds) rather than being at once, assimilable meanings ?" অর্থাৎ হার্টম্যানের মতে, ভাষাকে নিছক প্রচলিত অর্থের বাহন হিসেবে না দেখে সাহিত্যিক ভাষার নিজস্ব শক্তি উদ্ধার করার চেষ্টা করেন। এই সাহিত্যিক মুহূর্ত দর্শনেও আসে যখন দার্শনিকের ভাষা বা প্রত্যয় ব্যবহারের বিরুদ্ধে সংশয় ঘনিয়ে আসে। তখন আবার ভাষার দিকেই তাকাতে হয়—পুরনো শব্দের মধ্যে খুঁজতে হয় নতুন অর্থ, অথবা ব্যবহার করতে হয় নতুন শব্দ। এই সময়ে শব্দ নিছক শব্দ হিসেবেই—দাঁড়িয়ে থাকে—কেননা তার সর্বজনগ্রাহ্য সুনির্দিষ্ট ব্যঞ্জনা তখনও তৈরি হয়নি। সুতরাং দর্শনে এই নতুন ভাষা ব্যবহারের অবকাশ সব সময়ই থাকে—এমন ভাষা যা নতুন বলেই তা দিয়ে প্রচলিত দার্শনিক প্রত্যয়গুলি তেমন ধরা যায় না, এমন ভাষা যার মধ্য দিয়ে ক্রমশই ধরা দিতে থাকে এক নতুন দার্শনিক বিকল্প।

অবশ্য দর্শন বলতে যদি দার্শনিকরা যা বুঝে এসেছেন তাকেই বোঝায় তবে এই সাহিত্যিক মুহূর্ত একেবারেই নিষ্প্রয়োজন হয়ে পড়ে। দেরিদা তাঁর **মার্জিনস অফ ফিলোসফি**তে বলেছেন, দার্শনিকের স্বপ্ন এক সম্পূর্ণ ও শাশ্বত ভাষার যার, প্রত্যয়গুলি অপরিবর্তনীয়। আর এই প্রত্যয়গুলি অপরিবর্তনীয় বলেই এর বিরুদ্ধে সংশয়ের কোনো প্রশ্নই ওঠেনা। বলা বাহুল্য, দেরিদা কিন্তু দার্শনিকদের ব্যবহৃত তথাকথিত নিত্য প্রত্যয়ের বিরুদ্ধেই কথা বলেছেন। তাঁর মতে অনৈতিহাসিকের

প্রতি দার্শনিকের এই অবিচলিত বিশ্বাস তেমন দৃঢ়ীভূতক নয়। দর্শনের কোনো কোনো বই যখন আমরা পড়ি তখন এক বিশেষ দার্শনিক সংস্কারের প্রভাবে আমরা একটি বক্তব্যকেই মূলে বা স্থায়ী বলে মনে করি। কিন্তু বইটি পড়তে গিয়ে ফাঁকে ফাঁকে এমন কথাও পাই যা সেই মূল বক্তব্যের বাতাবরণ ক্ষুণ্ণ করে। দেরিদা এই মার্জিন বা ভিন্ন সুর অথবা রোটির্র ভাষায়, 'literary openness' এর দিকেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এই মার্জিন বা ভিন্ন সুর আবার নতুন করে, নতুন ভাষায় সাজানো যায়। তখন বইটির পট পাল্টে যায়—ফুটে ওঠে নতুন ছবি। এবং এর অর্থ দার্শনিকের কোনো কিছুকে অপরিবর্তনীয় বলে মনে করার বিশেষ প্রবণতার বাইরে চলে আসা। দেরিদা এই ভাবে নতুন করে লেখারই পক্ষপাতী। কিন্তু এর একটি সংকট আছে। মার্জিনের উপর জোর দিয়ে রূপান্তরহীনতার ঘেরাটোপে বন্দী দর্শনের কথা তিনি ভুলে যেতে পারেন যেমন করে নির্যাতন-মুক্ত দাস তার অত্যাচারী প্রভুকে ভুলে যায়। যদি তাঁর মনোভাব এই হয় তবে বলতে হয় দর্শনের সঙ্গে তাঁর সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ ঘটেছে। কিন্তু তাহলে দেরিদার লেখার প্রধান ভরটিই আর থাকেনা। কারণ যদি কেউ দর্শন সম্বন্ধেই কথা বলে থাকেন, যদি কেউ থাকেন দর্শনই যার মুখ্য উপজীব্য—তবে দেরিদার নামই মনে আসবে। আবার অন্য দিকে দেরিদা যদি অপরিবর্তনের প্রতি দার্শনিক ঝোঁককে আঘাত দিতে চান তবে তিনি যখন বলেন 'total, closed vocabulary' সম্ভব নয় তখন, সেটি-কেও এক পরিবর্তনহীন, প্রশ্নাতীত সত্য বলে গণ্য করতে হবে। তাহলে মার্জিনের আর কোনো গুরুত্ব থাকবে না। দেরিদা যে এই সংকট সম্পর্কে অবহিত নন তা নয়। তাই এই সংকট সমাধানে তিনি **মার্জিনস্ অফ ফিলোসফি**তে বলেছেন :

"....a new writing must weave and interlace these two motifs of deconstruction which amounts to saying that one must speak several languages and produce several texts at once." অর্থাৎ তিনি বলতে চান আমরা একই সঙ্গে দর্শনের ভিতরে থাকতে পারি এবং বাইরে আসতে পারি। দর্শনের ভিতরে থাকার অর্থ—তার ব্যবহৃত প্রত্যয়কে বোঝার চেষ্টা এবং তার অসংগতিকে তুলে ধরা। এবং একথা বলার বোধহয় প্রয়োজন নেই যে এই বাদ-প্রতিবাদ, যুক্তি ও বিরুদ্ধ যুক্তি তখনই সম্ভব হয় যখন দার্শনিক যে স্ট্যান্ডার্ড ভাষা ব্যবহার করেন তার অংশীদার হই আমরা। কিন্তু একই সঙ্গে আমরা এই দার্শনিক আবহাওয়ার বাইরে এসে নতুন ভাষা ও রীতিতে তুলে ধরতে পারি জগৎ ও জীবন বিষয়ে অন্য বিকল্প, অন্য দিগন্ত—প্রচলিত ভাষা ও যুক্তি দিয়ে যাকে বোঝা যায় না, কিন্তু যার অমোঘ স্বভাব ও আকর্ষণে প্রাণিত হয়ে উঠি আমরা। এই কথাটি আরও একভাবে বলা যায়। যে কোনো দার্শনিক যুক্তি ভাষা দিয়েই প্রকাশিত হয়। এবং সেই ভাষার অংশীদার না হলে দার্শনিক যুক্তিটিকে বোঝা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হয় না। সুতরাং দর্শনের ঐতিহ্য যে ভোক্যাবিউলারি লালন করে তাকে বুঝতে গেলে সেই

ভোক্যাবিউলারির বাইরে আসা চলে না। কেননা, বাইরে এলেই দর্শনে প্রত্যয়ের যে যুক্তির কাঠামোটি তৈরি হয়েছে তাকে ধরা আর সম্ভব হয় না। কথাটির অর্থ এই যে দার্শনিক যে প্রত্যয় বা যুক্তি ব্যবহার করেন তাকে বোঝা বা তাকে খণ্ডন করা—এসব তখনই অর্থবহ হয় যখন দার্শনিক যে ভাষা ব্যবহার করেন তার সঙ্গে আমাদের অন্তরঙ্গ সংযোগ থাকে। কিন্তু তা হলে দর্শনের ট্র্যাডিশনের বাইরে আসা কী করে সম্ভব হয়—যা দেরিদার অন্যতম অভিপ্রায়? এই সংশয়ের উত্তরে দেরিদার নিম্নলিখিত মন্তব্যটি বিশেষ ইঙ্গিতবহ :

"To make enigmatic what one thinks one understands by the words 'proximity' 'immediacy'.....is my final invention in this book." (**অফ গ্রামাটোলজি**) অর্থাৎ দেরিদা বলতে চান যুক্তি দেওয়াই ভাষার একমাত্র কাজ নয়। ভাষা দিয়ে আরও অনেক কিছু করা যায়—যেমন আদেশ দেওয়া, অনুরোধ করা এমনকি কৌতুক করাও। যদি তাই হয়, তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়ায় এই। দর্শনে ব্যবহৃত প্রত্যয়ের কাঠামোটি যে যুক্তি-শৃঙ্খলে গড়ে ওঠে তাকে খণ্ডন করতে গেলেও সেই দর্শনের ট্র্যাডিশনের মধ্যেই থাকতে হয়। দেরিদা কখনো-কখনো এই কাজ করেছেন। আবার এই ট্র্যাডিশনের বাইরেও তিনি আসতে পেরেছেন যখন তিনি যে প্রত্যয়ের আবহে দার্শনিক পরিমণ্ডলটি গড়ে উঠেছে তার অসারতা তুলে ধরেছেন বিরুদ্ধ যুক্তি দিয়ে নয়, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও তীক্ষ্ণ কৌতুকে। যার মধ্য দিয়ে পরিস্ফুটে হয়ে উঠেছে এই কথাই যে দর্শনের অপরিবর্তনীয় প্রত্যয় কাঠামোটি একটি বিশুদ্ধ প্রহেলিকা। □